180

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

নম্বর বিভ্রাট ॥ তাহমিনার মতো অসংখ্য পরীক্ষার্থী মানসিক নির্যাতনের শিকার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

তাহমিনা সুলতানা '৯৭ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল ঢাকা বোর্ড থেকে। প্রথম বিভাগে তার উত্তীর্ণ হবার কথা। একটি বিষয় ছাড়া সব বিষয়ে নম্বরও পেয়েছে সেরকম। কেবল ভূগোল বিষয়ের রচনামূলক অংশে নম্বর পেয়েছে ১২। অনেক দেন দরবার করে তার বাবা খাতা দেখার ব্যবস্থা করলেন। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও খাতা দেখলেন। তাঁদের মন্তব্য—মেয়েটি নিশ্চিত পাস করবে।

না, তাকে পাস নম্বর দেয়া হয়নি। চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেয়েটির বাবাকে জানিয়েছেন, বিধি না থাকায় খাতা পুনর্মূল্যায়ন করা যাবে না। মেয়েটির বাবা বাংলাদেশ ব্যাংকের জিএম, মেজর (অব) হোসেন। তিনি জানান, সঠিক নম্বর যাতে সে পায় সেজন্যই খাতা দেখা। কিন্তু নম্বর বাড়ানোর বিধিই যদি না থাকে তাহলে খাতা দেখে লাভ কি? তিনি জানান, যে বিধি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে অকারণে বিপর্যস্ত করে তা থাকা কতটা যৌক্তিক তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত।

আরেকজন অভিভাবক মোঃ আব্দুর রশিদ। তিনি অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ। '৯৪ সাল থেকে তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন বোর্ডের একটি ভুল সংশোধন করার জন্য। তাঁর মেয়ে রাশিদা আক্তার এসএসসিতে নম্বর পেয়েছে ৭৩৮। বাংলা প্রথমপত্রের রচনামূলক অংশে তাকে দেয়া হয়েছে (০০) ডাবল শূন্য। শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বোর্ড কিছুই করেনি। কারণ একটিই, বিধি নেই।

কি আছে ঐ বিধিতে? ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তোজাম্মেল হোসেন জানালেন, কোন খাতা পুনর্মূল্যায়ন করার বিধান আমাদের নেই। ৬১ সালের অর্ডিন্যান্সে একথা স্পষ্ট বলা আছে। তবে আমরা কেবল খাতা পুনর্নিরীক্ষণ করতে পারি। অর্থাৎ খাতায় নম্বরের যোগ ঠিক আছে কিনা কেবল সেটুকুই দেখি।

কেবল তাহমিনা বা রাশিদা নয়, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর এ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ঢাকা বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, প্রতি পাবলিক এক্সামিনেশনের ফল প্রকাশের পর কেবল ঢাকা বোর্ডে দশ সহস্রাধিক খাতা পুনর্মূল্যায়ন বা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন পড়ে। অন্যান্য বোর্ডেও আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় এরকম। মোট পাঁচ বোর্ডে প্রতি পাবলিক এক্সামিনেশনের পর এ ধরনের আবেদন পড়ে পঞ্চাশ সহস্রাধিক। সূত্রটি আরও জানায়, অনেকে মানসিক শান্তির জন্য আবেদন করে। তবে ভুক্তভোগীদের সংখ্যাই থাকে বেশি।

জানা যায়, '৬১ সালের ঐ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী খাতা পুনরায় দেখার পর কোন পরীক্ষার্থীর নম্বর সত্যি সত্যি বাড়লেও তাকে তা দেয়া হয় না। এ বঞ্চনা ও মানসিক কষ্ট নিয়ে ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীকে কাটাতে হয় গোটা শিক্ষাজীবন। অন্যদিকে এক শ্রেণীর পরীক্ষক দায়সারা গোছের খাতা দেখে পার পেয়ে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। খাতা দেখায় গাফিলতি বা ভুলের কারণে কোন পরীক্ষক শাস্তি পেয়েছেন এমন নজির নেই। ভুক্তভোগী অভিভাবক মেজর (অব) হোসেন জানালেন, যদি দায়ী পরীক্ষকদের খুঁজে শাস্তি দেয়া হতো তাহলে সব পরীক্ষকের সচেতনতা হয়ত বাড়ত।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তোজাম্মেল হোসেন বলেন, আমি যখন অধ্যাপনা করতাম তখন মনে করতাম এটা কালো আইন। কিন্তু যখন রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হয়ে এলাম তখন এ অভিজ্ঞতা হলো যে, আইনটা সঠিক। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনে বলা আছে, কোন খাতা পুনর্মূল্যায়ন করা যাবে না, পুনর্নিরীক্ষণ করা যাবে।

অধ্যাপক তোজাম্মেল হোসেন বলেন, খাতায় নম্বর দেয়া ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। তাই আমরা যদি খাতা পুনর্মূল্যায়ন করতে চাই তাহলে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল গ্রুপের জন্য অন্য কোন কাজই করতে পারব না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষার্থীকে সাফার করতে হয়। বৃহত্তর স্বার্থে এ ক্ষেত্রে বোর্ডের করার কিছুই নেই।